শাইখ সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রহ.

জীবন ও কর্ম

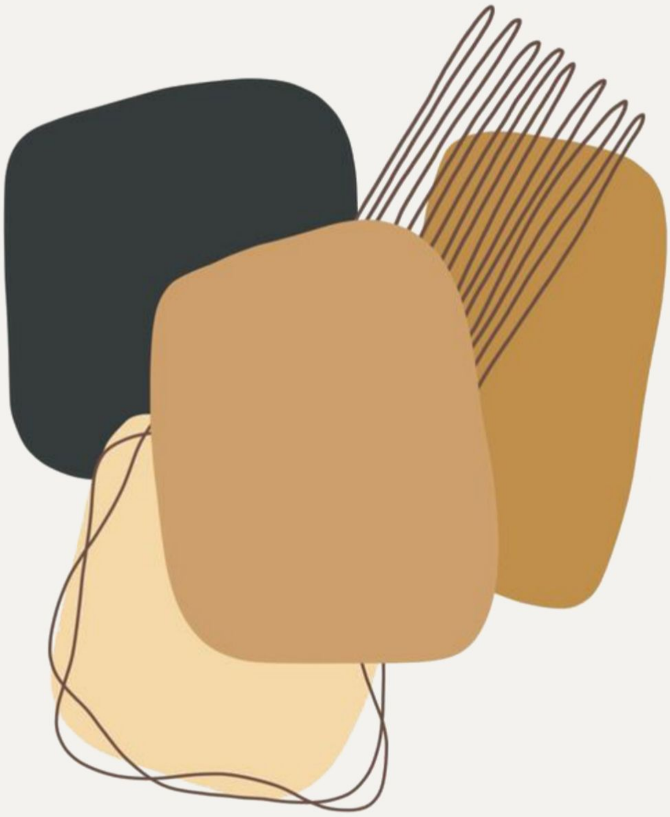

মুফতি আমিন পালনপুরি

উবায়দুল্লাহ আসআদ কাসেমি
(অনূদিত)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفۡسُ ٱلۡمُطۡمَئِنَّةُ ۝ ٱرۡجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةٗ مَّرۡضِيَّةٗ ﴾

‘হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার রবের নিকট
ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।’

[সূরা ফজর, ৮৯ : ২৭-২৮]

ফজর
পাবলিকেশন
নতুন ভোরের সন্ধানে

মুফতি আমিন পালনপুরি

শাইখ সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রহ.

জীবন ও কর্ম

(জন্ম : ১৯৪০, মৃত্যু : ১৯ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ)

অনুবাদ

উবায়দুল্লাহ আসআদ কাসেমি

সম্পাদনা

জোজন আরিফ

ফজর
পাবলিকেশন
নতুন ভোরের সন্ধানে

শাইখ সাঈদ আহমাদ পালনপুরি ﷺ জীবন ও কর্ম

মুফতি আমিন পালনপুরি

প্রথম সংস্করণ : যিলকদ ১৪৪১ হিজরি / জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশক

ফজর পাবলিকেশন

ই-মেইল : fajr.publication.BD@gmail.com

facebook.com/Fajr.Publication.BD/

প্রকাশনা : ৪

গ্রন্থস্বত্ব © প্রকাশক ২০২০।

প্রচ্ছদ : খালেদ হাসান খান, **টাইপোগ্রাফি :** আহমাদ বোরহান

মূল্য: বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রকাশিত

পিডিএফ পরিবেশক : পিবুক.কম

অর্পণ

আমার চেতনার বাতিঘর,
তরজুমানে দেওবন্দিয়াত,
হযরতুল উস্তায কুদ্দিসা সিররুহু।

... অনুবাদক

গ্রন্থসূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা
কিছু কথা	৭
জন্ম	৮
জন্মগত নাম	৮
শিক্ষাদীক্ষা	৮
শৈশবের উস্তাযগণ	৯
প্রাথমিক শিক্ষা	৯
মাজাহিরুল উলুমে ভর্তি	১০
দারুল উলুম দেওবন্দে দাখেলা	১১
দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষকবৃন্দ	১১
তিনি ছিলেন মেধায় অনন্য	১২
দারুল ইফতায় ভর্তি : তার প্রথম ছাত্র	১২
যেভাবে তিনি কুরআনের হিফজ সম্পন্ন করেন	১৩
তার যোগ্যতার মূল্যায়ন	১৩
নীড়ে প্রত্যাবর্তন	১৪
রান্দিরে কর্মজীবনের সূচনা	১৪
দারুল উলুম দেওবন্দে নিয়োগ	১৫
দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষকতার খিদমতসমূহ	১৬
অন্যান্য খিদমতসমূহ	১৮
রচনাবলী	১৯
শিক্ষকতা ও রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য	২২
সমৃদ্ধির পথে	২২

বাইআত ও অনুমতি	২৩
বাইতুল্লাহর যিয়ারত	২৪
সন্তানদের নিয়ে তার বাবার স্বপ্ন ও বাস্তবতা	২৪
বাবার মৃত্যু	২৬
মার তিরোধান	২৬
ভাইদের শিক্ষাদীক্ষা	২৬
সুন্নাতে আকদ	২৭
কুরআনপ্রেমিক পরিবার!	২৭
একটি গুরুত্বপূর্ণ অসিয়ত	২৮
একটি আবেদন!	৩১

কিছু কথা

গত ১৯ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ মঙ্গলবার, সকাল সাড়ে সাতটার সময় তিরোধান করেন মুহাদ্দিসে কাবির, ফখরে দেওবন্দ, তরজুমানে দেওবন্দিয়াত, আজহারে হিন্দ দারুল উলুম দেওবন্দের শাইখুল হাদীস ও প্রধান শিক্ষক, হযরতুল উস্তায মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি কুদ্দিসা সিররুহু। নিঃসন্দেহে, হযরতের শূন্যতা অপূরণীয়, তার মৃত্যুতে শোকাহত মুসলিম বিশ্ব। ইতিমধ্যে শোকবার্তা জানিয়েছেন বিশ্বের অনেক উলামায়ে কিরাম ও স্কলারগণ। মরহুমের বিয়োগে আমরাও গভীরভাবে শোকাহত। দুআ করি, আল্লাহ তাআলা যেন তার ভুল-ভ্রান্তিগুলোকে ক্ষমা করে তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করেন। আমীন ইয়া রব্ব। আমরা অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে তার আলোকিত জীবনকথা পাঠকমহলে তুলে ধরছি।

ফজর পরিবার

জন্ম

মরহুম মাওলানার জন্ম-তারিখ সংরক্ষিত নেই। তবে তার বয়স যখন দেড় বা পৌনে দুই বছরের কোঠায়, তখন বাবা জন্মস্থান ডাবহাডের জমি কিনেন, যার দলিলপত্র বিদ্যমান আছে। সে হিসেবে বাবা অনুমান করে তার জন্ম সন ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ বলেছেন। তিনি কালিড়া নামক স্থানে (জেলা : বানাস কাঁঠা, উত্তর গুজরাট) জন্মগ্রহণ করেন। এই জেলার কেন্দ্রীয় শহর হলো পালনপুর, যা ভারত স্বাধীনের পূর্বে ছিল মুসলিম নবাবদের রাজ্য। সেখানে *সুল্লামুল উলুম* নামে একটি মাদরাসা আছে, যেখানে মাধ্যমিক পর্যন্ত পাঠদান করা হয়।

জন্মগত নাম

মা-বাবা তার নাম রেখেছিলেন শুধু *আহমাদ*। কেননা, তার একজন মা-শরিক বড় ভাইয়ের নাম ছিল আহমাদ, তারই স্মরণে তার মা তার নাম রাখেন আহমাদ। সাহারানপুর মাজাহিরুল উলমে ভর্তির সময় *সাঈদ আহমাদ* নামটি তিনি নিজেই রেখেছিলেন। তখন থেকে এ নামেই তিনি বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধ। বংশের বয়স্ক বৃদ্ধরা এখনো তাকে *আহমাদ ভাই* নামে ডাকেন। যদিও এখন এমন বৃদ্ধ দু'চারজন-ই জীবিত আছেন। তার বাবার নাম ইউসুফ। দাদার নাম আলি, যাকে সম্মানস্বরূপ *আলিজি* বলা হতো।

শিক্ষাদীক্ষা

তার বয়স পাঁচ বা ছয় বছর হলে বাবা (যিনি ডাবহাডে কৃষিকাজে থাকতেন) তার শিক্ষাদীক্ষার সূচনা করেন। কিন্তু ক্ষেত-বাড়ির কাজের

কারণে বাবা তার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিতে পারেননি। এজন্য তাকে স্বীয় জন্মস্থান কালিড়ায় মক্তবে ভর্তি করিয়ে দেন।

শৈশবের উস্তাযগণ

তার মক্তবের উস্তাযগণ হলেন :

১) মাওলানা দাউদ সাহেব চৌধুরী রহিমাহুল্লাহ।

২) মাওলানা হাবিবুল্লাহ সাহেব চৌধুরী রহিমাহুল্লাহ।

৩) মাওলানা ইবরাহীম সাহেব জোনকিয়াহ রহিমাহুল্লাহ।

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি স্বীয় মামা মাওলানা আবদুর রহমান সাহেব রহিমাহুল্লাহুর সাথে *ছাপি* গমন করেন এবং দারুল উলুম ছাপিতে স্বীয় মামাসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দের কাছ থেকে ফারসির প্রাথমিক কিতাবাদি ছয় মাস পর্যন্ত অধ্যায়ন করেন। ছ'মাস পর মামা দারুল উলুম ছাপি ছেড়ে নিজ বাড়িতে ফিরে আসলে তিনিও তার সাথে জোনি সিন্ধিতে আসেন; এবং ছ'মাস পর্যন্ত তার কাছে ফারসির কিতাবাদি পড়েন। এরপর মুসলিহে উম্মাহ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ নজির মিয়া সাহেব পালনপুরি কুদ্দিসা সিররুহুর মাদরাসায় ভর্তি হন, যা পালনপুর শহরেই অবস্থিত। সেখানে চার বছর পর্যন্ত হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ আকবর মিয়া সাহেব পালনপুরি এবং হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হাশেম সাহেব বুখারি রহিমাহুল্লাহুর কাছে আরবির প্রাথমিক ও মাধ্যমিক কিতাবগুলো পড়েন।

মুসলিহে উম্মাহ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ নজির মিয়া সাহেব কুদ্দিসা সিররুহু ওই মহান ব্যক্তি, যিনি এই শেষ যুগেও ভ্রাতৃত্বদেরকে বিদআত, কুসংস্কার এবং সকল প্রকার অনৈসলামিক রীতিনীতি থেকে দূর করে হিদায়াত ও সুন্নাহর রাজপথে বের করে আনেন। আজ পালনপুর এলাকায় যে দ্বীনি পরিবেশ দৃষ্টিগোচর হয়, তা মাওলানারই খিদমতের ফলাফল।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আকবর মিয়া সাহেব রহিমাহুল্লাহ ছিলেন তার ছোট ভাই এবং তার ডান হাত। আর হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হাশেম সাহেব বুখারি রহিমাহুল্লাহ বুখারা থেকে দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষা গ্রহণের জন্য আগমন করেন। দাওরায়ে হাদীস পাশের পর তিনি প্রথমে পালনপুরে, পরে ইমদাদুল উলুম গুজরাটে; তারপর জামিয়া হুসাইনিয়া রান্দিরে (সুরত) এবং অবশেষে দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষকতা করেন। তিনি শেষদিকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারাহয় চলে যান এবং সেখানেই পরলোকগমন করেন। বাকিউল গারকাদে তিনি শায়িত আছেন।

মাজাহিরুল উলুমে ভর্তি

পালনপুরে শরহে জামি পর্যন্ত শিক্ষাদীক্ষার পর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৩৭৭ হিজরিতে সাহারানপুর (ইউ.পি.) সফর করেন এবং মাজাহিরুল উলুমে ভর্তি হয়ে তিন বছর পর্যন্ত ইমামুন নাহু ওয়াল মানতিক হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমাদ সাহেব জমোভি রহিমাহুল্লাহুর কাছে নাহু, মানতিক এবং ফালসাফার অধিকাংশ কিতাবগুলো পড়েন। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়ামিন সাহেব সাহারানপুরি, হযরত মাওলানা মুফতি ইয়াহইয়া সাহেব সাহারানপুরি, হযরত মাওলানা আবদুল আযিয সাহেব

রায়পুরি এবং হযরত মাওলানা ওয়াকার আলি সাহেব বিজনুরি রহিমাহুল্লাহুর কাছে পড়েন অন্যান্য কিতাবাদি।

দারুল উলুম দেওবন্দে দাখেলা

অতঃপর তিনি ফিকহ, হাদীস, তাফসীর এবং অন্যান্য বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্যে ১৩৮০ হিজরিতে দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন। প্রথম বছরে তিনি হযরত মাওলানা নসির আহমাদ খান সাহেব বুলন্দশহরি রহিমাহুল্লাহুর কাছে *তাফসীরে জালালাইন* (*আল-ফাওযুল কাবির*-সহ), হযরত মাওলানা সায়্যিদ আখতার হুসাইন সাহেব দেওবন্দি রহিমাহুল্লাহুর কাছে *হেদায়া* প্রথম দুই খণ্ড এবং হযরত মাওলানা বশির আহমাদ খান সাহেব বুলন্দশহরি রহিমাহুল্লাহুর কাছে *তাসরিহ-বসতে বাব*, *শরহে চোগমেনি*, *রিসালায়ে ফতহিয়া* এবং *রিসালায়ে শামসিয়া*-সহ হাইয়াত শাস্ত্রের অন্যান্য কিতাবসমূহ পড়েন। দ্বিতীয় বছর *মিশকাতুল মাসাবিহ*, *হেদায়া আখেরাইন*, *তাফসীরে বায়যাবি* ইত্যাদি কিতাবের পাঠ গ্রহণ করেন। অবশেষে তিনি ১৩৮২ হিজরিতে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন—যা ছিল দারুল উলুম দেওবন্দের শতবার্ষিকীর বছর।

দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষকবৃন্দ

তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে যেসব শিক্ষকবৃন্দ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তারা হলেন : হযরত মাওলানা সায়্যিদ আখতার হুসাইন সাহেব দেওবন্দি, হযরত মাওলানা বশির আহমাদ খান সাহেব বুলন্দশহরি, হযরত মাওলানা সাঈদ হাসান সাহেব দেওবন্দি, হযরত মাওলানা আবদুল জলিল সাহেব কিরানভি, হযরত মাওলানা আসলামুল হক সাহেব আজমি, হাকিমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারি মুহাম্মাদ

তায়্যিব সাহেব দেওবন্দি, হযরত মাওলানা ফখরুল হাসান সাহেব মুরাদাবাদি, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ জহুর সাহেব দেওবন্দি, ফাখরুল মুহাদ্দিসিন মাওলানা ফখরুদ্দিন আহমাদ মুরাদাবাদি, ইমামুল মাকুল ওয়াল মানকুল আল্লামা মুহাম্মাদ ইবরাহীম বিলয়াভি, মুফতিয়ে আযম হযরত মাওলানা মুফতি সায়্যিদ মাহদি হাসান সাহেব শাহজাহানপুরি, শাইখ মাহমুদ আবদুল ওয়াহহাব মাহমুদ সাহেব মিসরি এবং হযরত মাওলানা নসির আহমাদ খান সাহেব বুলন্দশহরি রহিমাহুমুল্লাহ।

তিনি ছিলেন মেধায় অনন্য

বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন প্রখর মেধাবী ও সমঝদার। কুতুববিনি এবং পরিশ্রমে ছিলেন অভ্যস্ত। এর সাথে উল্লিখিত আসাতিজায়ে কিরামের শিক্ষাদীক্ষা তার যোগ্যতাকে মাত্র বাইশ বছর বয়সেই চূড়ান্তে পৌঁছিয়ে দেয়। দারুল উলুম দেওবন্দের মতো বিরাট বিদ্যাপীঠে বাৎসরিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অর্জন করেন। অথচ সে বছর অতি যোগ্যতা সম্পন্ন অনেক ফারেগিনরা শুধু প্রথম স্থান অধিকারের জন্য ভর্তি হয়েছিলেন দাওরায়ে হাদীসে।

দারুল ইফতায় ভর্তি : তার প্রথম ছাত্র

তিনি দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করে ১৩৮২ হিজরির শাওয়াল মাসে *তাকমিলে ইফতায়* আবেদন করলে তা মঞ্জুর হয়। ফলে হযরত মুফতি সায়্যিদ মাহদি হাসান সাহেব শাহজাহানপুরির তত্ত্বাবধানে তিনি ফাতাওয়ার কিতাবাদি অধ্যয়ন এবং ফাতাওয়া প্রদানের অনুশীলন শুরু করেন। তিনি ছিলেন ভাইবোনদের মাঝে সবচেয়ে বড়। এজন্য দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করার পর আপন ভাইদের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি তিনি বিশেষ

গুরুত্ব দেন। অধমকে ১৩৮২ হিজরিতে নিজের সাথে দেওবন্দে নিয়ে আসেন এবং আমার কুরআন হিফজের সম্পূর্ণ জিম্মাদারি নিজেই গ্রহণ করেন।

যেভাবে তিনি কুরআনের হিফজ সম্পন্ন করেন

এ বছরই তিনি শাইখ মাহমুদ আবদুল ওয়াহহাব মাহমুদ মিসরি রহিমাহুল্লাহুর কাছে কুরআনে কারিমের হিফজ শুরু করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভালো একজন হাফেজ ও মিসরি কারি। তিনি জামিয়াতুল আযহার কায়রোর তরফে দারুল উলুম দেওবন্দে প্রেরিত হন।

মোটকথা, ১৩৮২-১৩৮৩ হিজরিতে তিনি একদিকে ফাতাওয়ার কিতাব পড়তেন, অপরদিকে অধমকেও কুরআনে কারিম হিফজ করাতেন এবং নিজেও কুরআনে কারিম হিফজ করতেন। এ কাজে তিনি এ পরিমাণ ব্যস্ত ও নিমগ্ন ছিলেন যে, সে বছর রমাদানুল মুবারকে বাড়িও যাননি। ফলে আমিও বাড়ি যাইনি। রমাদানের পর তার আরেক ভাই মৌলভি আবদুল মাজিদকেও তিনি দেওবন্দে ডেকে আনেন।

তার যোগ্যতার মূল্যায়ন

এদিকে ইফতা কর্তৃপক্ষ তার যোগ্যতাকে চূড়ান্তে পৌঁছানোর লক্ষ্যে তাকে দারুল ইফতায় আরও এক বছরের সুযোগ প্রদান করেন। সুতরাং, ১৩৮৩-৮৪ হিজরিতে তিনি ছোট ভাই মৌলভি আবদুল মাজিদ সাহেবকে ফারসি কিতাবসমূহ পড়াতেন, আমাকে কুরআনে কারিম হিফজ করাতেন, নিজেও কুরআন হিফজ করতেন। অন্যদিকে ফাতাওয়া প্রদানের খুবই চর্চা করতেন। ফাতাওয়া প্রদানে তিনি এতটা যোগ্যতা রাখতেন যে, মাত্র

ছ’মাস পর দারুল উলুম দেওবন্দের পরিচালনা কমিটি তাকে সহকারী মুফতির মর্যাদায় দারুল উলুম দেওবন্দে নিয়োগ প্রদান করে।

নীড়ে প্রত্যাবর্তন

অতঃপর ১৩৮৪ হিজরির ২১ শাওয়াল মাদরে ইলমি দারুল উলুম দেওবন্দকে তিনি সালাম জানিয়ে নিজ ঘরে ফিরে আসেন। এক সপ্তাহ ঘরে অবস্থান করে বাবা-মার যিয়ারতে ধন্য হন। অতঃপর ছোট ভাই মৌলভি আবদুল মাজিদকে (যিনি অধমের দু’বছরের বড় ছিলেন), মৌলভি হাবিবুর রহমান সাহেবকে (যিনি আমার থেকে অনুমানিক সাত/আট বছরের ছোট ছিলেন) এবং অধমকে সাথে নিয়ে রান্দিরে (সুরত) রওনা করেন এবং দারুল উলুম আশরাফিয়ায় শিক্ষকতা শুরু করেন।

রান্দিরে কর্মজীবনের সূচনা

হযরত কুদ্দিসা সিররুহু ১৩৮৪ হিজরির যিলকদ থেকে ১৩৯৩ হিজরির শাবান মাস পর্যন্ত মোট নয় বছর দারুল উলুম আশরাফিয়ায় দারস প্রদান করেন। সেখানে তিনি *সুনানু আবি দাউদ*, *জামি তিরমিযি*, *তহাবি শরিফ*, *আশ-শামায়িল*, *মুয়াত্তাইন*, *সুনানুন নাসায়ি*, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, *মিশকাতুল মাসাবিহ (আল-ফাওযুল কাবির-সহ)*, *তরজমায়ে কুরআন*, *হেদায়া আখেরাইন*, *শারহুল আকায়িদিন নাসাফিয়া*, *হুসামি* ইত্যাদি কিতাবসমূহ পড়িয়েছেন। একই সাথে সরব ছিলেন লেখালিখির

ময়দানেও। সে সময় তিনি *দাড়হি আওর আমবিয়া কি সুন্নাতে,*[১] *হুরমতে মুসাহরত* এবং *আল-আওনুল কাবির* রচনা করেন। তখনই তিনি কাসেমুল উলুমি ওয়াল খাইরাত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতাভি রহিমাহুল্লাহুর কিতাবসমূহ ও উলুম-মাআরিফের ব্যাখ্যা ও সহজকরণের কাজের সূচনা করেন; যার অত্যন্ত মূল্যবান একটি প্রবন্ধ *ইফাদাতে নানুতাভি* শিরোনামে কিস্তি আকারে *আল-ফুরকানে* প্রকাশিত হয়েছিল।[২]

দারুল উলুম দেওবন্দে নিয়োগ

মরহুমের মুহতারাম উস্তায হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হাশেম সাহেব বুখারি রহিমাহুল্লাহ—যিনি প্রথমে জামিয়া হুসাইনিয়া রান্দিরে পড়াতেন। শেষ পর্যন্ত দারুল উলুম দেওবন্দে তার নিয়োগ হয়। তিনি একটি চিঠির মাধ্যমে তাকে অবহিত করেন যে, দারুল উলুম দেওবন্দে একজন শিক্ষকের স্থান শূন্য। অতএব, আপনি শিক্ষকতার আবেদন পাঠিয়ে দিন। তিনি হযরত মাওলানা হাকিম মুহাম্মাদ সাদ রশিদ সাহেব রহিমাহুল্লাহুর সাথে পরামর্শক্রমে আবেদন করেন। সে বছরই শাবান মাসে মজলিসে শুরার বৈঠকে আরবি বিভাগের জন্য একজন শিক্ষক নিয়োগের আলোচনা আসে। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মনজুর নুমানি সাহেব রহিমাহুল্লাহ মরহুমের নামই প্রস্তাব করেন এবং সে মজলিসেই তার নিয়োগ চূড়ান্ত হয়ে যায়। তাকে শাবান মাসেই এ বিষয়ে অবগত করা হয়। অতঃপর রমাদানুল মুবারকের পর তিনি দারুল দেওবন্দে রওনা করেন। তখন

---

[১] বইটি অধমের অনুবাদে ***ফজর পাবলিকেশন*** থেকে প্রকাশনাধীন, করোনার কারণে ঝুলে আছে।—অনুবাদক।

[২] কিন্তু হযরতুল উস্তায কুদ্দিসা সিররুহু মৌলিক রচনার দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণে কাজটি আর সামনে অগ্রসর হয়নি। হায়! যদি এই মহতী কাজটি হযরতের হাতে করে মোম হয়ে আসত, তাহলে আমরা তালিবে ইলমরা এ থেকে কতই না উপকৃত হতাম।

থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি দারুল দেওবন্দে শিক্ষকতার খিদমত আঞ্জাম দেন। আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন এবং তার উলুম ও বারাকাত দিয়ে আমাদেরকে ধন্য করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষকতার খিদমতসমূহ

১৩৯৩ হিজরির শাওয়াল মাস থেকে এ লেখা পর্যন্ত তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে যেসব কিতাব পড়িয়েছেন এবং পড়াচ্ছেন এর বিস্তারিত আলোচনা সন হিসেবে নিম্নে দেওয়া হলো :

১৩৯৩-৯৪ হিজরি : মুসাল্লামুস সুবুত, হেদায়া প্রথম খণ্ড, সুল্লামুল উলুম, হাদিয়ায়ে সাইদিয়া, জালালাইন (প্রথম অর্ধেক, আল-ফাওযুল কাবির-সহ) এবং মুল্লা হাসান।

১৩৯৪-৯৫ হিজরি : মুসাল্লামুস সুবুত, শরহে আকায়িদে জালালি, মুল্লা হাসান, জালালাইন (২য় অর্ধেক) এবং আল-ফাওযুল কাবির।

১৩৯৫-৯৬ হিজরি : মুসামারাহ, দিওয়ানে মুতানাব্বি, মাইবুজি এবং তাফসীরে বায়যাবি (২১-২৫ পারা)।

১৩৯৬-৯৭ হিজরি : দিওয়ানে মুতানাব্বি, তাফসীরে বায়যাবি (২৬-৩০ পারা), মুল্লা হাসান এবং মিশকাতুল মাসাবিহ (সাময়িক)।

১৩৯৭-৯৮ হিজরি : মিশকাতুল মাসাবিহ (দ্বিতীয় খণ্ড, শারহু নুখবাতিল ফিকার-সহ), হুসামি (কিয়াসের অধ্যায়), মুল্লা হাসান, সাবয়ে মুআল্লাকা, হেদায়া এবং মুয়াত্তা লিল ইমাম মালিক।

১৩৯৮-৯৯ হিজরি : দিওয়ানে হামাসা, সাবয়ে মুআল্লাকা, তাফসীরে বায়যাবি (সুরা বাকারা), মিশকাতুল মাসাবিহ (২য় খণ্ড, শারহু নুখবাতিল ফিকার-সহ), তাফসীরে মাযহারি (১৬-২০ পারা), মুয়াত্তা লিল ইমাম মালিক, সিরাজি ফিল মিরাস এবং সুনানুন নাসায়ি।

১৪০০ হিজরি : মিশকাতুল মাসাবিহ (২য় খণ্ড, শারহু নুখবাতিল ফিকার-সহ), তাফসীরে বায়যাবি (২১-২৫ পারা), দিওয়ানে হামাসা, সাবয়ে মুআল্লাকা, মুয়াত্তা লিল ইমাম মালিক এবং সিরাজি।

১৪০১ হিজরি : মিশকাতুল মাসাবিহ (২য় খণ্ড, শারহু নুখবাতিল ফিকার-সহ), তাফসীরে বায়যাবি (২৬-৩০ পারা), তাফসীরে মাদারিকুত তানজিল (৬-১০), সিরাজি এবং মুয়াত্তা মুহাম্মাদ।

১৪০২ হিজরি : সুনানুত তিরমিযি (১ম খণ্ড), তাফসীরে বায়যাবি (সুরা বাকারা), সুনানু আবি দাউদ, সহীহ বুখারি (দ্বিতীয় খণ্ড), মুয়াত্তা মালিক এবং মুয়াত্তা মুহাম্মাদ।

১৪০৩ হিজরি : সুনানুত তিরমিযি (১ম খণ্ড), তাফসীরে বায়যাবি (সুরা বাকারা), সহীহ মুসলিম (১ম খণ্ড), মুকাদ্দিমাতুবনিস সালাহ, রশিদিয়া এবং সুনানু ইবনি মাজাহ।

১৪০৪ হিজরি : সুনানুত তিরমিযি (১ম খণ্ড), তাফসীরে বায়যাবি (বাকারা), হেদায়া (চতুর্থ খণ্ড) এবং তহাবি শরিফ।

১৪০৫ হিজরি : সুনানুত তিরমিযি (১ম খণ্ড), তাফসীরে বায়যাবি (সুরা বাকারা), হেদায়া (তৃতীয় খণ্ড), সহীহ বুখারি (১ম খণ্ড) এবং তহাবি শরিফ।

১৪০৬ হিজরি : সুনানুত তিরমিযি (১ম খণ্ড), তাফসীরুল কুরআন, হেদায়া (চতুর্থ খণ্ড) এবং তহাবি শরিফ।

১৪০৭ হিজরি : তালখিসুল ইতকান, সুনানুত তিরমিযি (১ম খণ্ড), তাফসীরুল কুরআন, হেদায়া (চতুর্থ খণ্ড) এবং তহাবি শরিফ।

১৪০৮ হিজরি : সুনানুত তিরমিযি (১ম খণ্ড), তাফসীরুল কুরআন, হেদায়া (চতুর্থ খণ্ড), তহাবি শরিফ এবং হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা।

১৪০৯ হিজরি : সুনানুত তিরমিযি (১ম খণ্ড), তাফসীরুল কুরআন, হেদায়া (চতুর্থ খণ্ড), তহাবি শরিফ ও হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ।

১৪১০ হিজরি : সুনানুত তিরমিযি (১ম খণ্ড), তাফসীরুল কুরআন, হেদায়া (তৃতীয় খণ্ড) এবং তহাবি শরিফ।

১৪১১ হিজরি থেকে এ (লেখা) পর্যন্ত তিনি সুনানুত তিরমিযি (১ম খণ্ড), তহাবি শরিফ এবং হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা পাঠদান করে আসছেন।[৩]

অন্যান্য খিদমতসমূহ

উল্লিখিত শিক্ষকতার খিদমত ব্যতীতও তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে যেসব খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তার বিস্তারিত আলোচনা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়, শুধু কিছু খিদমতের আলোচনা করা হলো :

১) ১৪০২ হিজরিতে হযরত মাওলানা মুফতি নিজামুদ্দিন সাহেব রহিমাহুল্লাহ দীর্ঘ দিনের ছুটি নেন, হযরত মাওলানা মুফতি

[৩] মৃত্যুকালীন সময়ে তিনি ছিলেন দারুল উলুম দেওবন্দের শাইখুল হাদীস এবং প্রধান শিক্ষক।

মাহমুদ সাহেব গাঙ্গুহি রহিমাহুল্লাহও সাহারানপুরে চলে যান, আরও কিছু মুফতিয়ানে কিরাম দারুল উলুম থেকে পৃথক হন। এজন্য কর্তৃপক্ষ মরহুম এবং অধমকে ইফতার সংশ্লিষ্ট কিতাবসমূহ পড়ানোর সাথে সাথে ইফতা বিভাগের তত্ত্বাবধান এবং ফাতাওয়া প্রদানের নির্দেশ জারি করে। আমরা সুচারুরূপে একে আঞ্জাম দিয়েছি।

২) যখন থেকে দারুল উলুম দেওবন্দে *মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নুবুওয়াত* প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন তিনি এর নাজিম নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৪১৯ হিজরিতে ব্যস্ততার কারণে মজলিসে শুরা বরাবর তিনি এই পদ থেকে অব্যাহতির আবেদন করলেও মজলিসে শুরা তা গ্রহণ করেনি।

৩) উল্লিখিত খিদমতের পরও হযরত মুহতামিম সাহেব (কারি মুহাম্মাদ তায়্যিব রহিমাহুল্লাহ) লিখিত বা মৌখিক বক্তব্য প্রদানের খিদমতসমূহ তাকেই সোর্পদ করতেন। তিনি সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে তা আঞ্জাম দিয়েছেন, যার দীর্ঘ বিবরণ এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়।

রচনাবলী

হযরতের রচনাবলী অনেক, যা প্রকাশিত হয়ে পূর্ব-পশ্চিম দিগন্তে বিস্তৃত। নিম্নে কয়েকটির পরিচয় তুলে ধরা হলো :

১) ***তাফসীরে হিদায়াতুল কুরআন*** : এটি সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য একটি তাফসীরগ্রন্থ। ৩০ তম পারা এবং ১ থেকে ৯ পারা পর্যন্ত লিখেছেন হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ উসমান কাশিফ হাশেমি

সাহেব রাজুপুরি রহিমাহুল্লাহ, যা মোট আট খণ্ড। দুই খণ্ড ব্যতীত বাকি সব খণ্ড পালনপুরি হযরতের লেখা। অবশ্য হাশেমির লিখিত খণ্ডগুলোও তিনি পুনরায় লিখেছেন।[৪]

২) ***রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ শরহে উর্দু হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা*** **:** এটি তার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। এর মাধ্যমেই তিনি বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছেন, যা বিশাল কলেবরে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত। এছাড়াও জনসাধারণের বোঝার সুবিধার্থে এর পাঠ্যাংশ ব্যতিরেকে মূল বিষয়বস্তুগুলো আলাদা করে *কামিল বুরহানে এলাহি* নামে চার খণ্ডে প্রকাশ করেন এবং মূল আরবি কিতাবও টীকাটিপ্পনী-সহ দুই খণ্ডে মুদ্রণ করেন।[৫]

৩) ***তুহফাতুল কারি শরহে উর্দু সহীহুল বুখারি*** **:** যা তার তাকরিরের সমষ্টি, মোট বারো খণ্ডে মুদ্রিত। বইটিতে সহীহ বুখারির তারাজিম এবং ফিকহি মাসয়ালাগুলো আসবাবে ইখতিলাফ-সহ নেহায়েত সহজলভ্য করেছেন। ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহুর সূক্ষ্মতা বুঝতে এই ব্যাখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪) ***তুহফাতুল আলমায়ি শরহে উর্দু সুনানে তিরমিযি*** **:** যা আট খণ্ডে প্রকাশিত। সুনানুত তিরমিযি বুঝতে এর ভূমিকা অপরিসীম।

---

[৪] আলহামদুলিল্লাহ, হযরতুল উস্তায কুদ্দিসা সিররুহু হাশেমির লিখিত খণ্ডগুলোও পুনরায় লিখেছেন। অধম অকপটে বলতে পারি যে, কুরআনে কারিম সহজে বোঝার জন্য এই তাফসীরের বিকল্প নেই। এই একটি রচনাই তার পাণ্ডিত্য পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট। তাফসীরটি অধমের অনুবাদে আসবে, ইনশাআল্লাহ।—অনুবাদক।

[৫] সংযোজনের সাথে।—অনুবাদক।

বাস্তবতা হলো, এই ব্যাখ্যাগ্রন্থ অন্যান্য ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোকে আলমারিতে ঢুকিয়ে দিয়েছে।[৬]

৫) ***আল-আওনুল কাবির*** : যা *আল-ফাওযুল কাবির* এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ। তিনি মূল বই *আল-ফাওযুল কাবির* নতুন করে আরবিও করেছেন, যা অত্যন্ত সুচারু ও গুরুত্ববহ। এই নতুন আরবি এডিশনই এখন দারুল উলুম দেওবন্দ সহ অন্যান্য মাদরাসায় পড়ানো হয়, যা মূলত অতীতের অন্যান্য আরবির সংস্করণ।

এছাড়া তার *ফয়যুল মুনইম*, *মাবাদিল ফালসাফা*, *মুয়িনুল ফালসাফা*, *মিফতাহুত তাহজিব*, *আসান মানতিক*, *আসান সরফ*, *মাহফুজাত*, *আপ কেসে ফাতওয়া দে*, *কিয়া মুক্তাদি পর ফাতেহা ওয়াজেব হে*, *ইলমি খুতবাত*, *হায়াতে ইমাম আবু দাউদ*, *মাশাহির মুহাদ্দিসিনন ও ফুকাহায়ে কেরাম আওর তাজকিরা রাবিয়ানে কুতুবে হাদীস*, *হায়াতে ইমাম তাহাবি*, *ইসলাম তাগাইউর পজির দুনিয়ে মে*, *নুবুওয়াত নে ইনসান কু কিয়া দিয়া*, *দাড়হি আওর আমবিয়া কি সুন্নাতে*, *হুরমতে মুসাহরত*, *তাসহিল আদিল্লায়ে কামিলা*, *হাওয়াশি ও আনাভিন ইজাহুল আদিল্লা*, *হাওয়াশি ইমদাদুল ফাতাওয়া (১ম খণ্ড)*, *জুবদাতুত তহাবি*, *জলসায়ে তাজিয়াত কা শরয়ি হুকুম* সহ[৭] আরো অনেক রচনা দেশ-বিদেশে সমাদৃত।

---

[৬] সংযোজনের সাথে।—অনুবাদক।

[৭] এটি হযরতুল উস্তায কুদ্দিসা সিররুহুর শেষ রচনা। বইটি মূলত শোকসভাকে কেন্দ্র করে লিখেছেন। কিন্তু এর মাধ্যমে দেওবন্দি মতাদর্শকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বইটি অধমের অনুবাদে ***চেতনার মশাল*** নামে প্রকাশিত, ***মাকতাবাতুস সুন্নাহ***, বাংলাবাজার থেকে। বইটি সকলের সংগ্রহে রাখার দাবি রাখে।—অনুবাদক।

শিক্ষকতা ও রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য

তার রচনাবলীর বৈশিষ্ট্য বলার প্রয়াস রাখি না। যারা তার ছাত্রত্ব গ্রহণে ধন্য হয়েছেন, বা তার লেখনীর সাথে পূর্ণ পরিচয় রাখেন, তারাই এ কথা অনুধাবন করতে সক্ষম। তার বক্তব্যের ধরন নেহায়েত প্রভাবকারী, পাঠদান সমাদৃত, রচনাবলী অত্যন্ত সহজলভ্য ও বোধগম্য, সাদাসিধে বুঝ, যা সকলের কাছে গ্রহণীয়। তার বক্তব্য যেমন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং ইলমি সূক্ষ্মতায় পরিপূর্ণ ছিল, তেমনি লেখনীও ছিল নেহায়েত গোঁছানো ও স্পষ্ট।

সমৃদ্ধির পথে

হযরতুল উস্তায কুদ্দিসা সিররুহুকে আল্লাহ তাআলা অনেক সৌকর্য এবং পরাকাষ্ঠা দ্বারা ধন্য করেছিলেন। তার রুচি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, স্বভাব সাধাসিধে ও মনোরম। মেজাজে ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও মধ্যমপন্থা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে কল্যাণকামিতা, স্মৃতি আগন্তুক, অকস্মাৎ লিপিকার। তিনি ছিলেন একজন সচ্ছল লেখক। তিনি হক-বাতিল, সঠিক-বেঠিকের মধ্যে পার্থক্যকরণের পরিপূর্ণ যোগ্যতা রাখতেন। হাকায়িক-মাআরিফের বোধগম্যে তিনি ছিলেন কালের অদ্বিতীয়। তার সবচেয়ে বড় উৎকৃষ্টতা হলো, তিনি নিজের কাজে অত্যন্ত কূটবুদ্ধিসম্পন্ন এবং অবস্থার সাহসিকতার মোকাবিলাকারী। আমি তার মতো দিনরাত পরিশ্রমকারী স্বচক্ষে দেখেনি।[৮]

[৮] এমনও তো হতো যে, পুরা রাতে একবারও ঘুমাতেন না।—অনুবাদক।

তার সমস্ত ছাত্রগণ জানে যে, তার দারস কতটুকু গ্রহণীয়? আর যাদের তার লেখনী পড়ার ও বক্তব্য শোনার সুযোগ হয়েছে, তারাই জানে যে, তার লেখনী ও বক্তব্য কী পরিমাণ সারগর্ভ, সুচারু ও সমন্বয়কারী। তার খাদেমরা জানেন, তিনি নিজের এবং আপন লোকদের কিতাবের সংশোধন ও মুদ্রণে কতটুকু তাগিদ করতেন এবং নিজের ভাই-বেরাদর এবং পরিবার-পরিজনের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি কতটুকু লক্ষ্য রাখতেন।

বাইআত ও অনুমতি

তিনি যেমন ইলমে জাহিরে পরিপূর্ণতা রাখতেন, ইলমে বাতিনি দ্বারাও তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ। কিন্তু তিনি একে এই পরিমাণ গোপন রাখতেন যে, সাধারণত মানুষ জানত, তিনি শুধু বাহ্যিক জ্ঞানেরই দক্ষতা রাখেন। অথচ বাস্তবতা হলো, তিনি ছাত্রকাল থেকেই হযরত শাইখুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া সাহেব রহিমাহুল্লাহুর কাছে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীনের সাহচর্যেও ধন্য হয়েছিলেন। তিনি মাজাহিরুল উলুমে ছাত্র থাকাকালে বিশেষত হযরত মাওলানা আবদুল কাদের সাহেব রায়পুরি রহিমাহুল্লাহুর মজলিসে অংশগ্রহণ করতেন। হযরত মাওলানা মুফতি মুজাফফর হুসাইন সাহেব মাজাহেরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বাইআতের অনুমতিও লাভ করেন।[৯]

[৯] অনুমতিপত্রটি দেখে আপনি চমকে যাবেন। পরে এগুলো সংযোজন করব, ইনশাআল্লাহ।—অনুবাদক।

বাইতুল্লাহর যিয়ারত

মরহুম কুদ্দিসা সিররুহু বেশ কয়েকবার হারামাইন শরিফাইনের যিয়ারতে ধন্য হয়েছেন। সর্বপ্রথম ১৪০০ হিজরি, মোতাবেক ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে পরিবার সহ জাহাজে করে ভ্রমণ করে ফরয হজ্জ আদায় করেন। অতঃপর ১৪০৬ হিজরিতে আফ্রিকা থেকে দ্বিতীয়বার হজ্জ করেন। তিনি তো প্রথমবারই নিজের ফরয হজ্জ আদায় করেছিলেন, এজন্য দ্বিতীয় এই হজ্জ আদায় করেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরফে বদলি হজ্জ হিসেবে। অতঃপর ১৪১০ হিজরি, মোতাবেক ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে সৌদি আরবের হজ্জ মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে আদায় করেন তৃতীয় হজ্জ। এছাড়া আরও বেশ কিছু হজ্জ-উমরাহ দ্বারা তিনি ধন্য হয়েছিলেন।[১০]

সন্তানদের নিয়ে তার বাবার স্বপ্ন ও বাস্তবতা

শাইখুল ইসলাম মাওলানা শাব্বির আহমাদ উসমানি, মাওলানা বদরে আলম মিরাঠি সাহেব এবং মুহাদ্দিসে কাবির হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ বানুরি রহিমাহুমুল্লাহ যখন ডাবিলে পড়াতেন, তখন হযরত কুদ্দিসা সিররুহুর পিতা সেখানে পড়তেন। তিনি ছিলেন হযরত মাওলানা বদরে আলম সাহেব মুহাজিরে মাদানি রহিমাহুল্লাহুর খাদেম। কিন্তু পারিবারিক দুরাবস্থার কারণে তিনি শিক্ষা পরিপূর্ণ করতে পারেননি। এজন্য তিনি তার ছেলেদেরকে মাওলানা শাব্বির আহমাদ উসমানি, মাওলানা বদরে আলম মিরাঠি এবং মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ বানুরি

[১০] ছাত্রদের সবক নষ্ট হবে বলে পরীক্ষার বন্ধ চলাকালে তিনি উমরাহ আদায় করতেন। সুবহানাল্লাহ!—অনুবাদক।

রহিমাহুমুল্লাহুর মতো রত্ন বানানোর আশা পোষণ করতেন। মাওলানা বদরে আলম রহিমাহুল্লাহ তাকে নসিহত করেছিলেন যে, 'ইউসুফ! যদি তুমি তোমার ছেলেদেরকে ভালো আলিম বানাতে চাও, তাহলে হারাম এবং নাজায়িয সম্পদ থেকে বিরত থাকো; এবং ছেলেদেরকেও হারাম, নাজায়িয সম্পদ থেকে বাঁচিয়ে রেখো। কেননা যে শরীর নাজায়িয ও হারাম মাল দ্বারা লালিত হয়, সে শরীরে ইলমের নূর প্রবেশ করে না।'

হযরত মাওলানা রহিমাহুল্লাহ তার বাবাকে এজন্যই এ নসিহত করেছেন যে, তখন আমাদের পুরো বংশ সুদে জর্জরিত ছিল। আমাদের দাদাও সুদ গ্রহণ করে একটি জমি কিনেছিলেন। তখন বাবা ছিলেন ডাবিলের ছাত্র। এ ব্যাপারে দাদার সাথে তার মতবিরোধ হয়। ফলে দাদা তাকে পৃথক করে দেন। ফলে বাবা হারাম সম্পদ থেকে বাঁচার লক্ষ্যে বাধ্য হয়ে শিক্ষা ছেড়ে পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি পাক্কা প্রতিজ্ঞা করেন যে, প্রয়োজনে নিজে অনাহারে থাকব, তবুও হারাম মাল হাতে লাগাব না। আমি যদিও লেখাপড়া করতে পারিনি, তবে আল্লাহ তাআলা যেন আমার সন্তানদেরকে ইলমে দ্বীন দান করেন। সুতরাং, বাবা রহিমাহুল্লাহ অবৈধ, হারাম মাল এবং সন্দেহপূর্ণ সম্পদ থেকে বেঁচে থাকতেন এবং নিজের সন্তানদেরও বাঁচিয়ে রাখতেন। তাদের শিক্ষাদীক্ষার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিতেন এবং পাবন্দির সাথে নামায-রোযা আদায় করতেন। আমার জানা মতে, তার কোনো নামায কাযা হয়নি। মার ইন্তিকালের পর বাবা কুরআন হিফয শুরু করেন, এবং সাত/আট পারা হিফয করে ফেলেন। কিন্তু, হায়াত আর সাড়া দেয়নি!

বাবার মৃত্যু

১৪১ হিজরির যিলকদ মাসে একদিন তিনি তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠেন। একটু গরম অনুভব হলে গোসল করে কাপড় পরিবর্তন করেন। তখন বুকে ব্যথা অনুভব হলে ভাই আবদুল মাজিদকে আওয়াজ দিয়ে ডাক দেন। ভাই আবদুল মাজিদ তাড়াতাড়ি করে তার খিদমতে উপস্থিত হয়ে দেখেন বাবার সমস্ত শরীর ঘামে ভর্তি। তিনি নিজেই বুক দাবিয়ে চৌকির উপর বসে আছেন। তিনি এই অবস্থা দেখে হতভম্ব হয়ে ভাই আবদুর রহমানকে (যিনি এক/দেড় মাইল দূরে থাকতেন) এবং ডাক্তার আনার ফিকির করতে লাগলেন। বাবা বললেন, ডাক্তার আনার কোনো প্রয়োজন নেই। এ কথা বলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি আল্লাহর পিয়ার হয়ে গেলেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন।

মার তিরোধান

আমাদের মাও ছিলেন দ্বীনের জরুরি বিষয়ে অবগত। তিনি ছিলেন পারিবারিক বিষয়ে দক্ষ এবং অত্যন্ত পরিপাটি। নামায-রোযার খুবই গুরুত্ব দিতেন। তিনি ছিলেন সালেহা, আবেদা, সাবেরা ও শাকেরা একজন নারী। ১৩৯৯ হিজরির ১০ মুহররম আশুরার রোযা রাখেন এবং ইফতারের পর তিরোধান করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন।

ভাইদের শিক্ষাদীক্ষা

তার ছিল মা-শরিক একজন ভাই, আপন চার ভাই এবং চার বোন। মা-শরিক ভাইয়ের নাম ছিল আহমাদ। যিনি তার চেয়ে বড় ছিলেন। তিনি

নিজস্ব ভাই বোনদের মাঝে বড় ছিলেন। তার ছোট আবদুর রহমান, পরে মৌলভি আবদুল মাজিদ, এরপর অধম। অতঃপর মাওলানা হাবিবুর রহমান। তিনি যখন দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে শিক্ষা অর্জন করে ফারেগ হন, তখন আবদুর রহমানের বয়স ছিল পনেরো থেকে বেশি। তখন আমি আর আবদুল মাজিদ পড়তাম মক্তবে। এজন্য প্রথমে তিনি আমাকে নিজের সাথে দেওবন্দ নিয়ে যান। এক বছর পর ভাই আবদুল মাজিদকেও কাছে ডাকেন। ফাতাওয়া প্রদানের অনুশীলনের সাথে সাথে আমাদের দুই ভাইকেও তিনি পড়াতেন।

সুন্নাতে আকদ

ভাই সাহেব কুদ্দিসা সিররুহুর বৈবাহিক সম্পর্ক এবং সুন্নাতে আকদ ১৩৮৪ হিজরির শেষ দিকে মামা হাফেজ মৌলভি হাবিবুর রহমান সাহেব রহিমাহুল্লাহুর বড় মেয়ের সাথে সম্পন্ন হয়। মামা ছিলেন কুরআনে কারিমের হাফেজ, ডাবিল থেকে শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। তিনি মার ইন্তিকালের পর চব্বিশ ঘণ্টার অধিকাংশ সময় কুরআনে কারিম খতম করে ইসালে সওয়াব করতেন। কিন্তু যৌবনকালেই দুই মেয়ে এবং এক ছেলে রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

কুরআনপ্রেমিক পরিবার!

হযরত কুদ্দিসা সিররুহুর সম্মানিতা স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত শাকেরা, সাবেরা, আবেদা ও যাহেদা একজন নারী। তিনি ছিলেন কুরআনে কারিমের একজন হাফেজা। নিজের সমস্ত ছেলে-মেয়েদের হিফজের শিক্ষিকাও ছিলেন তিনি। বিবাহের পর ঘরের কাজ আঞ্জাম দেওয়ার সাথে সাথে হযরত কুদ্দিসা সিররুহুর কাছে কুরআনে কারিম হিফজ করেন।

হিফজকালীন ও তাকমিলের পর নিজের সমস্ত ছেলে-মেয়েদেরকে পবিত্র কুরআনে কারিম হিফজ করিয়েছেন।[১১]

এই ভাগ্যবান মহিলার গর্ভেই হযরত কুদ্দিসা সিররুহুর **১১** জন ছেলে ও ৩ জন মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। সবচেয়ে বড় ছেলে একটি দুর্ঘটনায় শাহাদত বরণ করে এবং একজন মেয়ের বাল্যকালেই ইন্তিকাল হয়ে যায়।[১২] **১০** জন ছেলে, ২ জন মেয়ে এখনো জীবিত আছেন।[১৩] আল্লাহ তাআলা তাদের জীবন দীর্ঘায়িত করুন, তাদেরকে ইলমে-আমলে সম্মানিত বাবার স্থলাভিষিক্ত করুন, আমীন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ অসিয়ত

ছেলের অবর্তমানে নাতিরা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া একটি প্রসিদ্ধ বিষয়। আর এটি ফারাইজের নীতিকথা *আল-আকবার ফাল আকবার* এর উপর নির্ভর করে। এ নীতিমালা থেকেই পিতা থাকলে দাদা হয় বঞ্চিত, ভাইয়ের বর্তমানে অন্য ভাইয়ের সন্তান হয় মাহরুম। কিন্তু নাতিদের বিষয়টি নিয়ে অনেক লোক ইসলামি শিক্ষার বিরুদ্ধে আঙ্গুল ওঠাতে চেষ্টা করে যে, এটি কেমন ইনসাফ? ছেলে উত্তরাধিকারী হবে। কিন্তু, নাতি-নাতনিরা বঞ্চিত থাকবে? যারা সাধারণত দুর্বল ও অসহায় হয়ে থাকে। এই অভিযোগ বাস্তবতায় মুসলিমদের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামি শিক্ষা প্রত্যেক দিক থেকে পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু মুসলিমরা যদি এর সঠিক পদ্ধতির উপর আমল না করে, তাহলে এর

---

[১১] তিনি সর্বমোট **১১** জন ছেলে, ২ মেয়ে এবং ২ জন পুত্রবধূকে হাফেজ-হাফেজা বানিয়েছেন। (সূত্র : *তুহফাতুল আলমায়ি*)—অনুবাদক।

[১২] মেয়ের মৃত্যু নিয়ে রয়েছে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা।—অনুবাদক।

[১৩] আরেকজন ছেলে গত বছর ইন্তিকাল করেছেন।—অনুবাদক।

চিকিৎসা কী হতে পারে? ইসলাম এক-তৃতীয়াংশে অসিয়তের তো অধিকার দিয়েছে, যাতে করে তারা এমন নাজুক প্রয়োজনে এই অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। এজন্য দাদার পক্ষে উচিত হলো, আগে নাতি-নাতনিদের জন্য অসিয়ত করা। প্রয়োজনে তাদেরকে ছেলের অংশ থেকেও বেশির অসিয়ত করতে পারবে। এখন যদি দাদা মালের মুহাব্বতে অসিয়তের সাহস না করে এবং আকস্মিক চলে যায়। ফলে নাতি-নাতনিরা বঞ্চিত থাকে, তাহলে এটি ইসলামি শিক্ষার দোষ নয়, বরং দাদারই দোষ। সেই এর জিম্মাদার।

বিষয়টি স্পষ্ট করার পর আমি হযরত কুদ্দিসা সিররুহুর একটি অসিয়তের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত এই জীবনচরিতের ইতি টানছি, যাতে যারা এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন, তারাও প্রয়োজনে তার মতো নিজের নাতি-নাতনিদের জন্য অসিয়ত করতে পারেন। *লাইতা লাআল্লা* করবে না। জীবনের তো কোনো সার্টিফিকেট নেই। আল্লাহ না করুন, যদি মানুষ হঠাৎ চলে যায়, তাহলে এসব বাচ্চাদের পেরেশানি হওয়া সত্ত্বেও দাদার এমন নীতি ইসলামি শিক্ষার বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

যখন হযরত কুদ্দিসা সিররুহুর বড় ছেলে মুফতি রশিদ আহমাদ রহিমাহুল্লাহুর আকস্মিক শাহাদাতের ঘটনা ঘটে, তখন বাড়ি (পালনপুর) থেকে সমস্ত ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন শোকবার্তা দিতে দেওবন্দে চলে আসেন। ভাই সাহেব কুদ্দিসা সিররুহু নিজের ছেলেদের এবং ভাইবোনদের সামনে মরহুমের বাচ্চাদের জন্য এই মর্মে অসিয়ত করেন, 'যত দিন আমি জীবিত থাকব, মরহুমের দুই সন্তানকে আমার ছেলেদের মতো লালন-পালন করব। মৃত্যুর পর আমার ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে মরহুমের প্রত্যেক সন্তান একজন ছেলের পরিমাণ অংশ পাবে। কেননা, দুই ছেলের মিরাসও এক-তৃতীয়াংশ থেকে কম হবে। আর আমার এক-

তৃতীয়াংশে অসিয়তের অধিকার রয়েছে।' সমস্ত আত্মীয়-স্বজন এর উপর সাক্ষী ছিল।

অসিয়তের পর তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলে তিনি বলেন : 'আল্লাহ তাআলার লক্ষ লক্ষ শুকরিয়া যে, আমার একজন সন্তানকে নিয়ে গেলেন, এর বদলে দিলেন আরও দুজন সন্তান। এখন আমার ১২ জন সন্তান হয়ে গেল।'[১৪]

[১৪] রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ, ১/৮২২-৮৩। যা মূলত উস্তাযে মুহতারাম মুফতি মাওলানা আমিন সাহেব পালনপুরি জিদা মাজদুহু *আলখাইরুল কাসির* এর ভূমিকায় লিখেছিলেন। জীবনিটি ***দেওবন্দিয়াত ও আমরা***, পৃ. ১৯৭ থেকে ২১৪ এ মুদ্রিত। হযরতুল উস্তায কুদ্দিসা সিররুহুর দীর্ঘ জীবনকথা আসছে, ইনশাআল্লাহ।—অনুবাদক।

একটি আবেদন!

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনাদের কাছে মুহাদ্দিসে কাবির, ফকিহে নফস, হযরতুল উস্তায কুদ্দিসা সিররুহুকে দুআয় শামিল রাখতে বিনীত অনুরোধ করছি। আমি হযরতের একজন অযোগ্য ছাত্র হিসেবে আপনাদের কাছে এতটুকু প্রত্যাশা করছি। আপনাদের যেকোনো ইবাদাত হযরতের ইসালে সওয়াবের জন্য পেশ করতে পারবেন, আপনাদের সাওয়াবে কোনো ঘাটতি হবে না, ইনশাআল্লাহ।

উবায়দুল্লাহ আসআদ কাসেমি

থুবাং, জৈন্তাপুর, সিলেট।

উসতাজে হাদিস, জামেআ কাসিমিয়া দারুল উলুম নারায়ণগঞ্জ।

২৪ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

ফজর পাবলিকেশন